

আবী ব্যাবর্তন সীমা লংঘন, টি-রশ্মি, আর-টি এফেক্ট  
এবং অনুবর্তী আবিষ্কার সমূহ  
আনিস রহমান, পিএইচ. ডি.

Overcoming Abbe's Diffraction Limit, T-ray, the R-T Effect  
and consequential discoveries

Anis Rahman, Ph.D.

ভূমিকাঃ আবী' ব্যাবর্তন সীমা

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র। সূক্ষ্ম জিনিষের নাড়ি-নক্ষত্র বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করাই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রধান কাজ। মাইক্রোস্কোপ অবশ্যই কোন নতুন কিছু নয়। বিবর্ধক কাচের ব্যবহার শুরু হয়েছিল সেই ১৩ শতাব্দী থেকে। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও এবং পরে লিউবেনহুক ([Anton van Leeuwenhoek](#)) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করেন। লিউবেনহুক স্বনির্মিত মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মানব শরীরের কোষ আবিষ্কার করেন এবং তখন থেকেই কোষবিজ্ঞানের শুরু হয়। পরে ওই সাধারণ মাইক্রোস্কোপের আরো উন্নতি সাধিত হয় এবং যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পরে।

সেই সময় থেকে শুরু করে গত কয়েকশ' বছর এই যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা কোষবিজ্ঞানের প্রভূত গবেষণা করে আসছে। ১৯৩১ সালে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার পর, যৌগিক মাইক্রোস্কোপকে “আলোক-মাইক্রোস্কোপ” (light microscope) বলা শুরু হয়। তবে আলোক-মাইক্রোস্কোপ শব্দটি অতটা বহুল ব্যবহৃত নয়; তাই মাইক্রোস্কোপ মানে আমরা আলোক-মাইক্রোস্কোপকেই বুঝি।

এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানী প্রত্যহই এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন এবং এগুলোর এক সুবিশাল অংশই হল যৌগিক বা আলোক-মাইক্রোস্কোপ। কিন্তু

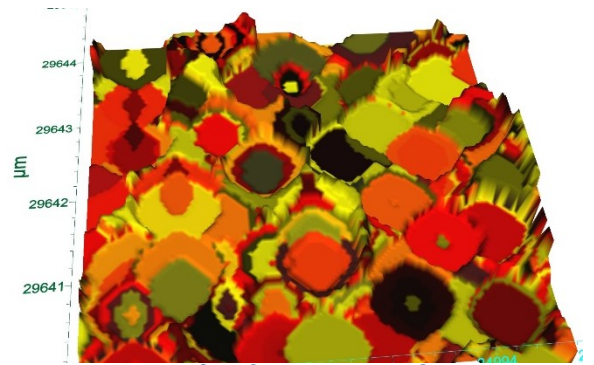


Figure 1. টি-রশ্মির সাহায্যে গৃহিত মানব ত্বকের কোষের ছবি। © Anis Rahman 2020

যাঁরাই এই মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করেন তাঁদের বড় একটি অপূর্ণ ইচ্ছা হল এই মাইক্রোস্কোপের ক্ষমতা যেন আরও একটু বেশী হয়, যাতে করে তাঁরা আরও ছোট জিনিষ আরও বড় এবং বিস্তারিত দেখতে পান। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি মৌলিক সমস্যা হল “আবী’র ব্যাবর্তন সীমা” নামক সীমাবদ্ধতা।

খুব সহজ ভাষায়, এই ব্যাবর্তন সীমাই নির্ধারণ করে দেয় যে একটি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কত ছোট বস্তু কেখা সম্ভব। ১৮৭৩ সালে আর্নেস্ট আবী এই ব্যাবর্তন সীমা প্রতিষ্ঠা করেন [১]। একটি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কতটা সূক্ষ্ম বস্তু পরীক্ষার দেখতে পাওয়া সম্ভব তা নির্ভর করে আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা (wavelength) এর ওপর। আর্নেস্ট আবী প্রমাণ করেন – মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সবচেয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বস্তু দেখা সম্ভব তার সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সমান হতে পারে। অর্থাৎ, মাইক্রোস্কোপ যে আলোর সাহায্যে চিত্র তৈরির কার্যকারীতা সম্পন্ন করছে, সেই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্ধেক অপেক্ষা কোন ছোট বস্তু চিত্রায়িত করা সম্ভব না। এবং এটি একটি মৌলিক সীমারেখা যা “আবী’র ব্যাবর্তন সীমা” বা শুধু “ব্যাবর্তন সীমা” (diffraction limit) নামে পরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ, দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ৩৮০ ন্যানোমিটার থেকে ৭৪০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত। কাজেই, ব্যাবর্তন সীমা অনুযায়ী ১৯০ ন্যানোমিটার এর ছোট কোন বস্তু আলোক-মাইক্রোস্কোপের দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ২৫৬ ন্যানোমিটার বা আরো ছোট হতে পারে। সেক্ষেত্রে আরো কিছুটা ছোট বস্তু দেখা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু অতিবেগুনী রশ্মি খালি চোখে দেখা সম্ভব না; তাই বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

কিন্তু বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদেরা এই ব্যাবর্তন সীমারেখা মানতে রাজী নন। তাঁরা ততক্ষণই এটা মেনে নেন যতক্ষণ অন্য কোন উপায় থাকে না। মূলত এটাই মানুষের প্রকৃতি। গাড়ী চালানোর উপায় থাকলে কেন বাইসাইকেল চালাবে? তবে হ্যাঁ, গাড়ী না থাকলে, বাইসাইকেলটালেই ধুয়ে মুছে যত্ন করে ব্যবহার করতে হবে। আর গাড়ী যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তা পাওয়ার জন্যে অনবরত প্রচেষ্টা করতেই হবে! ব্যাবর্তন সীমার ব্যাপারেও ওই একই যুক্তি খাটে। অর্থাৎ, বহু যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন – কিভাবে এই ব্যাবর্তন সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীই অনেকভাবে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই ভূমিকা থেকে বোঝা যায়, আলোকের ব্যাবর্তন সীমা অতিক্রম করা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখায় তার একটি উপায় নিয়ে আলোচনা করব যেটি কিনা আমাদের

গবেষণা প্রসূত একটি অগ্রগতি [২]।

## টি-রশ্মি

তার আগে টি-রশ্মির ব্যাপারটা একটু বলা দরকার, কারণ, শিরোনামে শব্দটি রয়েছে এবং মূলত এটা একটি নতুন প্রযুক্তি। এই টি-রশ্মির সাহায্যেই আমরা আবি ব্যাবর্তন সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি - তবে এটা অন্য ভাবেও করা সম্ভব হতে পারে। বিশ্বজগতে যতরকম রশ্মি রয়েছে তাদের সমষ্টিকে বলা হয় বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বর্ণালী (electromagnetic spectrum) (চিত্র নং ২) বা শুধু বর্ণালী। এই বর্ণালীতে রশ্মিগুলো সাজানো হয়েছে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বড় থেকে ছোটর দিকে (বাম থেকে ডানে) আথবা কম্পাঙ্ক (frequency) অনুযায়ী ছোট থেকে বড়র দিকে (ডান থেকে বামে)।

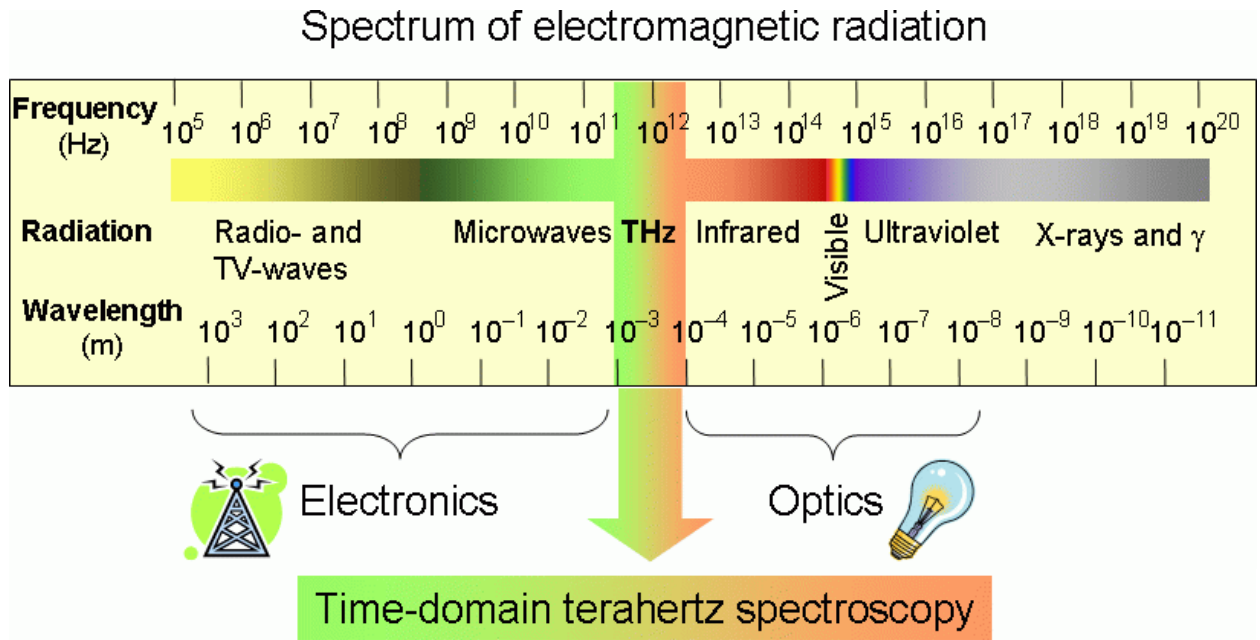


Figure 2. T-ray lies between the microwave and the infrared wavelengths.

রশ্মিগুলির নামানুযায়ী, সর্ব বামে রয়েছে বেতার তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভ এবং সর্ব ডানে আছে গামা রশ্মি। অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী, বেতার তরঙ্গ সবচেয়ে বড় এবং গামা রশ্মি সবচেয়ে ছোট। কিন্তু এই সর্ববৃহত এবং সর্বক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলির মধ্যে যে সুবিশাল বিস্তৃতি, তার মধ্যে রয়েছে আরো অনেক রকমের তরঙ্গ যাদের নিজস্ব নাম এবং আলাদা আলাদা ধর্ম রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০০ মিটার হতে পারে; অন্যদিকে গামা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত

ক্ষুদ্র, প্রায় ৩০ ফেমটো-মিটার বা  $30 \times 10^{-15}$  মিটার। এই দুই প্রান্তসীমার মাঝখানে রয়েছে আরো অনেক রশ্মি। দুই নং চিত্র অনুযায়ী মাইক্রোওয়েভ এবং অবলোহিত তরঙ্গের মাঝখানের রশ্মিকে বলা হচ্ছে টেরাহার্টজ রেডিয়েশান বা টি-রশ্মি। এই টি-রশ্মির কতগুলো বিশেষ গুণ রয়েছে যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা যায়। উল্লেখ্য যে, গত শতাব্দীর ৯০ এর দশকের আগে পর্যন্ত বর্ণালীর এই টি-রশ্মির জায়গাটি ফাঁকাই ছিল, কারণ, ব্যবহারিক কাজে লাগানোর উপযুক্ত টি-রশ্মির বিকিরণ-উৎস তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সবকিছুর মতই, টি-রশ্মি নিয়েও অনেক গবেষণা হচ্ছে সারা দুনিয়া জুড়ে, কিন্তু প্রশ্ন হল – কেন? টি-রশ্মি না থাকলেই বা কার কি ক্ষতি হবে? এখনকার সময়ে প্রযুক্তির কি কোন অভাব রয়েছে? তা নাই; তবে তা সত্ত্বেও প্রতিনিয়তই আমরা আরো বেশী সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি – তাই নতুন আবিষ্কার প্রয়োজন।

টি-রশ্মির একটি বিশেষ গুণ হল, এটি এক্স-রের মত অনেক কিছু ভেদ করে যেতে পারে কিন্তু এক্স-রের মত তেজস্ক্রিয়তা নাই; ফলে পরীক্ষণীয় বস্তুর রশ্মিজনিত কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু টি-রশ্মি একটি আয়ন-উৎপাদনহীন রশ্মি (non-ionizing radiation), তাই এটা মানব শরীরের জন্যে ক্ষতিকর নয়। উপরন্তু, টি-রশ্মির শক্তি হচ্ছে স্বাভাবিক তাপমাত্রার (বা কক্ষ তাপমাত্রার) শক্তির সমান। অর্থাৎ, কক্ষ তাপমাত্রাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে এবং টি-রশ্মিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে, এই দুই শক্তির পরিমাণ এক সমান। এটা গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, অন্য যে কোন রশ্মি – যা দিয়ে মানব শরীরের রোগ নির্ণয় করা সম্ভব (যেমন এক্স-রে) – সেগুলোর শক্তি অনেক বেশী; সে কারণে, দেহের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যে ক্ষতিকর। কাজেই, টি-রশ্মি রোগ নিরূপনের কাজে লাগালে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না – বরং ফলাফল অনেক নির্ভুল এবং সঠিক হয়। টি-রশ্মি দিয়ে কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা করাও সম্ভব, যেমন ত্বকের ক্যান্সার।

মানব শরীরের রোগ নির্ণয় করা ছাড়াও টি-রশ্মির আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। সেমি-কন্ডাক্টর শিল্প-কারখানা এবং ন্যানোপ্রযুক্তি শিল্পেও টি-রশ্মি ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন রকমের সুক্ষ্ম পরিমাপের জন্যে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে দেওয়া হচ্ছে।

## আর-টি এফেক্ট

মূলত, আর-টি এফেক্ট (বা রহমান-টমালীয়া এফেক্ট [৩, ৪]) হল টি-রশ্মি উৎপাদনের একটি অভিনব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এখানে “ডেনড্রিমার” নামক একটি পলিমার-উপাদান (dendrimer, a nanomaterial) ব্যবহার করা হয় এবং নব আবিষ্কৃত ডেনড্রিমার ডাইপোল প্রজ্বলন

(Dendrimer Dipole

Excitation, “DDE”) [3]

পদ্ধতির (বা কৌশলের) মাধ্যমে টি-রশ্মি তৈরী করা হয়। এই DDE পদ্ধতি (বা আর-টি এফেক্ট) আবিষ্কারের আগে এতটা ক্ষমতাসালী টি-রশ্মি উৎপাদন করা সম্ভব হত না। একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে [৩] প্রদর্শন করা হয়েছে – এই আর-টি এফেক্ট দ্বারা অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টি-রশ্মি উৎপাদন করা সম্ভব যা বর্ণালী বিশ্লেষণ এবং ক্যামেরাবিহীন চিত্র গ্রহণের জন্যে অতি প্রয়োজনীয়।



Figure 3. Dr. Anis Rahman and Dr. Donald Tomalia

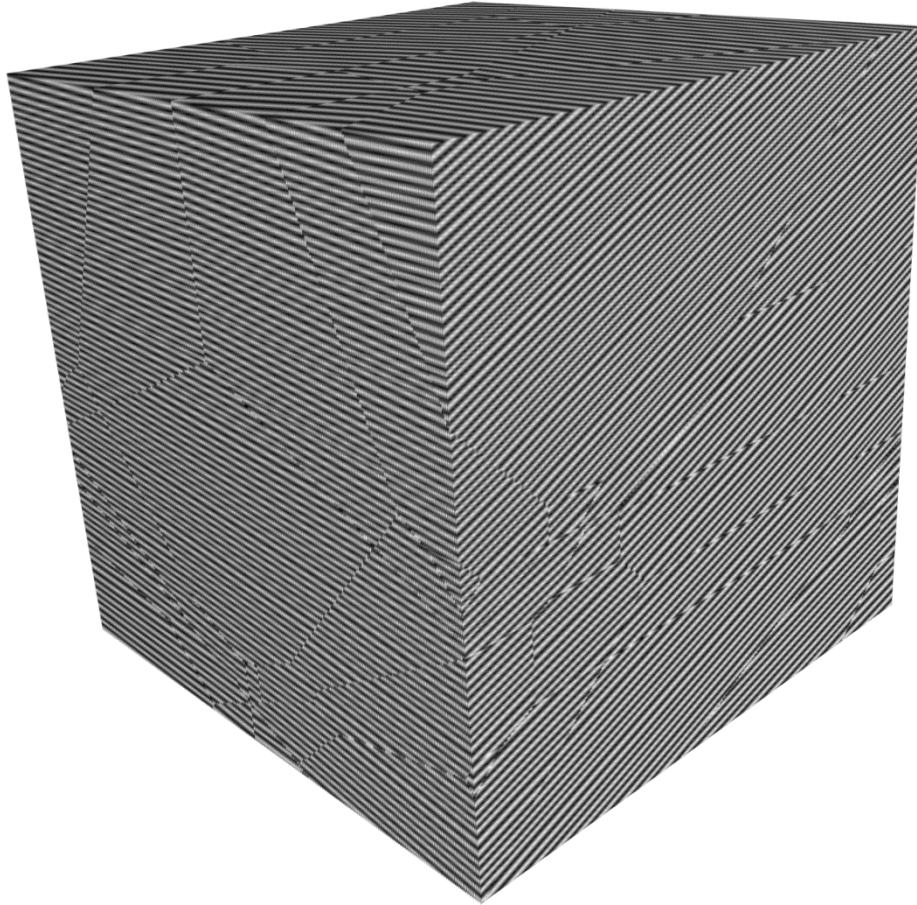
## আবী ব্যাবর্তন সীমা লঙ্ঘন এবং ক্যামেরাবিহীন চিত্র গ্রহণ

প্রথমে আমরা ঠিক করে নেই যে কি কি অগ্রগতি দরকার। আগেই বলেছি, আলোক-মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তুর চিত্র গ্রহণের বেলায় ব্যাবর্তন সীমা সবচেয়ে বিশাল বাধা। অর্থাৎ, বড় আলোক তরঙ্গের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তুর চিত্র গ্রহণের একটি প্রযুক্তি আবিষ্কার করাটাই মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু একটি জরুরী প্রশ্ন হল, “ব্যাবর্তন সীমা লঙ্ঘন করতে পারলেই কি সেই লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে?” এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব হল, “না।” যদিও ব্যাবর্তন সীমা লঙ্ঘন

করা নিয়ে বিশ্বব্যাপী এত উত্তেজনা, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তুর চিত্র গ্রহণ করা – যেমন, অণুসমষ্টির চিত্র এবং আণবিক দূরত্বের মাপ – এটা শুধু ব্যাবর্তন সীমা লঙ্ঘন করতে পারলেই সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আমরা অবলোহিত আলোর কথা বলি, তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল ৮০০ ন্যানোমিটার থেকে প্রায় ৩০০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে, আমরা যদি ৪০০ ন্যানোমিটারের ছোট কোন বস্তুর চিত্র অবলোহিত আলোকের সাহায্যে চিত্রিত করতে পারি তাহলেই ব্যাবর্তন সীমা লঙ্ঘন করা হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে এই প্রকার ব্যাবর্তন সীমা লঙ্ঘন তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না, কারণ, আমাদের লক্ষ্য হল বড় তরঙ্গের আলোকের সাহায্যে আরো ক্ষুদ্র বস্তু যেমন অণুসমষ্টির চিত্র যা ০.১ ন্যানোমিটার (1 Å) বা তার থেকেও ছোট অথবা কয়েক ন্যানোমিটার মাপের কোন বস্তুর চিত্র গ্রহণ করতে পারা। আমাদের গবেষণা থেকে ঠিক সেই রকম একটি আবিষ্কারই করা হয়েছে যেখানে বড় আলোক-তরঙ্গ দিয়েও অণু-পরমাণুসমষ্টির বা ন্যানোমিটার মাপের বস্তুর চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব। এবং এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে টি-রশ্মির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানে একটি আণবিক জালির ত্রিমাত্রিক ছবির উদাহরণ দেওয়া হল। পরবর্তিতে টি-রশ্মির উপকারীতা, ব্যবহার এবং ইমেজিং এর আলোচনা হবে [5]।

দ্রষ্টব্যঃ [T-ray Image a Day | Facebook](#)





*Figure 4. Lattice 3D (volume) image, 20 nm × 20 nm × 20 nm.*

### রেফারেন্সেস

- [1] Abbe E. (1873) “Contributions to the theory of the microscope and the microscopic perception,” Arch Mikrosk Anat 9(1): 413-468.
- [2] Anis Rahman and Donald Tomalia, “Terahertz-based nanometrology: multispectral imaging of nanoparticles and nanoclusters in suspensions,” J Nanopart Res (2018) 20:297. DOI: 10.1007/s11051-018-4396-y
- [3] A. Rahman and A. K. Rahman, "Nanoscale metrology of line patterns on semiconductor by continuous wave terahertz multispectral reconstructive 3D imaging overcoming the Abbe diffraction limit," in IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing. DOI: 10.1109/TSM.2018.2865167
- [4] A. Rahman, AK Rahman, T. Yamamoto, and H. Kitagawa, “Terahertz Sub-Nanometer Sub-Surface Imaging of 2D Materials,” Journal of Biosensors & Bioelectronics, 2016, 7:3, DOI: 10.4172/2155-6210.1000221

- [5] Paul M. Welch, Timothy A. Dreier, Harsha D. Magurudeniya, Matthew G. Frith, Jan Ilavsky, Sönke Seifert, Aunik K. Rahman, Anis Rahman, Amita Joshi Singh, Bryan S. Ringstrand, Christina J. Hanson, Jennifer A. Hollingsworth, and Millicent A. Firestone, “3D Volumetric Structural Hierarchy Induced by Colloidal Polymerization of a Quantum-Dot Ionic Liquid Monomer Conjugate,” *Macromolecules* 2020, 53, 2822–2833, DOI: 10.1021/acs.macromol.0c00011

## লেখক পরিচিতি

ড. আনিস রহমান বিশ্বের প্রথম ৫০ জন সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন অন্যতম বিজ্ঞানী হিসাবে পুরস্কার পেয়েছেন পরপর দুইবার। তিনি ন্যানোটেকনলজী ও টেরাহার্টজ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির একজন বিশ্বসেরা শীর্ষস্থানীয় গবেষক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, এবং এন্টারপ্রিনিয়র। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং আণবিক শক্তি কমিশনে তাত্ত্বিক গবেষণা করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরে মার্কেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও এ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি বিভাগে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। এরপর একটি বৃহত কোম্পানীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করেন। হ্যারীসবার্গে অবস্থিত এই কোম্পানীর নাম “এ্যাপ্লাইড রিসার্চ এন্ড ফোটোনিক্স ইনকর্পোরেটেড,” বা সংক্ষেপে “এ.আর.পি.।” ড. রহমানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম হল, “ডেড্রিমার ডাইপোল এক্সাইটেশন,” “হাই পাওয়ার কন্টিনিউয়াস ওয়েভ টেরাহার্টজ সোর্স এ্যান্ড সেন্সর,” “টেরাহার্টজ টাইম-ডোমেইন স্পেক্ট্রোমিটার,” “ওভারক্যামিং আবি’ ডিফ্র্যাকশান লিমিট,” “ক্যামেরা-লেস ল্যাটিস রেজোলিউশান ইমেজিং,” “ন্যাচারাল ইন্ডেক্স কনট্রাস্ট,” এবং “রহমান-টমালীয়া এফেক্ট।” এই আবিষ্কারগুলো কাজে লাগিয়ে এ.আর.পি. থেকে যে যন্ত্রাদী উৎপাদন করা হয়, সেগুলো ইউ.এস. আর্মী, সেমিকন্ডাক্টর, বায়ো-মেডিক্যাল, এবং ন্যানোটেকনলজী সহ বিভিন্ন সেক্টরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।